আমার ক্লাব
আমাদের ক্লাব

আতাউস সামাদ

প্রেস ক্লাবের খাবারে বিশেষ কিছু একটা আছে। নাহলে আমার ছোট মেয়ে সেই কবে ক্লাবের সিঙ্গাড়া খেয়েছিল কিন্তু এখনও অনেক বিকেলেই বলে, 'আব্বা, আজ যদি বাইরে যাও আর যদি প্রেস ক্লাবের দিকেই যাও তাহলে আমার জন্যে একটা সিঙ্গাড়া এনো।' একবার ওদের স্কুলের পিকনিকের সময় প্রেস ক্লাবের বানানো সিঙ্গাড়া দিয়ে দিয়েছিলাম। ওর কোনও কোনও শিক্ষিকা নাকি এখনও মাঝে মাঝে ওকে বলেন, 'তুমি আবার কবে প্রেস ক্লাবে যাবে?'

বাংলাদেশের সচিব পর্যায়ের আমলাদের অন্ততঃ দুইজন একাধিকবার বলেছেন যে, প্রেস ক্লাবের লুচি-নিরামিষ 'জুটি'র সঙ্গে চা গলাধঃকরণ করতে করতে জাতীয় সমস্যা আলোচনায় তাঁরা যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন দেশের কোনও এক সংকট মুহূর্তে, তা নাকি আজও মন থেকে যাচ্ছে না।

এই সেদিনও একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ বললেন, 'প্রেস ক্লাবে এক কাপ চা খেতে খেতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। বড় ভালো লাগতো।'

কোনও একটি মাত্র কারণে এঁদের সবাই প্রেস ক্লাবের খাবার ভালোবেসে ফেলেছেন, সেটা ঠিক নয়। কথাই তো আছে, 'আপ রুচিসে খানা, পর রুচিসে পেহান না', নিজের পছন্দ মতো খাবে, অন্যের পছন্দ মতো পরবে। কাজেই আমাদের মেনে নিতেই হবে যে এঁরা প্রত্যেকেই প্রেস ক্লাবের খাবারে এমন কিছু পেয়েছেন, যা এঁদের রসনা ও মন দুই-ই তৃপ্ত করেছে। তবে কার কাছে সেটা যে কোন্‌টা তা তাঁদেরকেই বলতে হবে। আমার কথা হলো যে, আমাদের প্রেস ক্লাবের সার্বজনীনতা আছে। সবাই কিছু পায় সেখানে। অথবা পেত।

আমার মেয়েকে যদি প্রশ্ন করি যে, প্রেস ক্লাবের কথা তোমার কি মনে পড়ে বলো তো, তাহলে সে উত্তর দেয়, পশ্চিম দিকে মাঠ ছিল আর ওখানে একটা স্লিপার ছিল। সেখানে দৌড়াদৌড়ি করতাম, আর স্লিপারটায় চড়ে সরসর করে পিছলে নেমে আসতাম।

ওর শিক্ষিকাদের কাউকে প্রশ্ন করার সুযোগ হয়নি যে প্রেস ক্লাবে ওঁরা কোনওদিন গেছেন কিনা এবং সেখানকার কথা কিছু মনে পড়ে কিনা। সেরকম প্রশ্ন করলে হয়তো বা বলবেন, গণআন্দোলনের সময় একবার গিয়েছিলাম।

আমলা দুই জনের একজন বলেছিলেন যে, জেনারেল এরশাদের আমলের শেষার্ধে সরকারের ভেতরে নিয়ম-শৃঙ্খলা যখন ভেঙে সন্দেহ ও শঙ্কায় দোদুল্যমান অবস্থায়, পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝার জন্যে প্রেস ক্লাবে ঢুকে পড়েছিলাম।

রাজনীতিবিদ বললেন, 'আন্দোলনের বিক্ষোভ কর্মসূচী যেদিন থাকতো, সেদিন তো দুইবার যেতো হতো প্রেস ক্লাবে। একবার যেতাম মিছিল করার ফাঁকে একটু দম নেওয়া আর এক কাপ চা দিয়ে গলা ভেজানোর জন্যে। আরেকবার যেতাম নতুন কর্মসূচী ঘোষণা দেবার উদ্দেশ্যে। আর অন্য সময় যেতাম পরিচিত অন্যান্য রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিয়ে মাথাটা খোলাসা করে আসার জন্যে। তাতে মনটাও চাঙ্গা হতো।'

এঁদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাব কিছুকাল আগেও সব বয়সের এবং নানান কাজের নানান ধরনের মানুষের জন্যে দেখা দিত এক ধরনের সঞ্জীবনী রূপ নিয়ে।

ব্যক্তিগতভাবে, আমাদের প্রেস ক্লাব (এভাবে বললে পুরনো লাল ইটের বাড়িটি আর এখনকার ইমারত দুটোই বোঝাবে) আমার জীবনের অংশ। সাংবাদিকতায় পুরোপুরি যোগ দেবার ছয় মাসের মাথায় চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়ে এই পেশা থেকেই বিদায় নেবার পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেদিন হঠাৎ করেই প্রেস ক্লাবের সিঁড়িতে মূসা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরের দিন প্রায় ঘাড়ে ধরেই তদানিন্তন পাকিস্তান অবজারভারে নিয়ে গেলেন। তারপর থেকে আর পেশা ছাড়ার কথা ভাবতে হয়নি। মূসা ভাইয়ের সঙ্গে সেই নাটকীয় দেখা হওয়ার পেছনেও কিছু ঘটনা ছিল। সেসব কথা গুছিয়ে বলার ইচ্ছা আছে– আর কোনও কারণে না হলেও জীবনের অন্য প্রান্তে এসে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্যে। যেই পুরনো ভবনটির সিঁড়ি থেকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে ভেসে উঠেছিলাম জীবন সাগরে, সেই বাড়িটিতে পাকিস্তানী হানাদাররা কামানের গোলা মেরেছিল ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে। পশ্চিম দিকের দোতলার দেওয়ালে দুটো বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল গোলার আঘাতে। কিন্তু বাড়িটি তবু পড়েনি। একাত্তরের ২৭ মার্চ কারফিউ শিথিল হলে প্রেস ক্লাবে ছুটে গিয়েছিলাম। তখন আক্রমণের মুখেও গর্বিত দুর্গের মতো দাঁড়িয়ে থাকা প্রেস ক্লাব ভবনটি দেখে সত্যিই মনে হয়েছিল, আমরা বাঙালীরা জাতি হিসেবে মরবো না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই, ইনশা আল্লাহ। সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেভাবে পারি দেশের জন্যে লড়াই করবোই। সেদিন আহত ওই বাড়িটির চেহারায় কেমন যেন একটা দীপ্তি ছিল।

প্রেস ক্লাবের নতুন ভবনটি ঘিরেও কিছু ঘটনা ঘটেছে, যার একটি হলো ঢুকতেই বাঁ হাতের ঘর–ইউনিয়ন অফিসটির অর্গলবদ্ধ অবস্থা, যা প্রেস ক্লাবের উজ্জ্বল ইতিহাসকে মলিন করে দেয়।

কি আর করা, সব সময় তো সমান যায় না। আপাতত সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

বিবর্তন হবেই– ভালো না মন্দ সে হিসেব করার সুযোগ পেলেই হলো

প্রয়াত ফজলে লোহানীর মতো 'যদি কিছু মনে না করেন' উক্তিটি আপনাদের কাছে সবিনয়ে

পুনরুল্লেখ করে এবং বাকায়দা মাফ চেয়ে নিয়ে আমার নিজের ও আশেপাশের মানুষদের মনে এখন যেসব প্রশ্ন, আশঙ্কা এবং ভয়-ভীতি কাজ করছে, তার কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। এগুলো বেশিরভাগই আমাদের পেশা, কাজ ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে।

একটা সহজ-সরল ছোট কাহিনী দিয়ে শুরু করি। আমাদের এই জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভবনটি আমার জীবদ্দশায় বদলে গেল তিন বার। প্রথম ছিল একটি মাঝারি গোছের লাল ইটের দালান। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কামান দাগে এই ভবনে। বাড়িটি আপনা থেকেই একটি ঐতিহাসিক দালান হয়ে ওঠে। সেই লাল দালানটি আজ আর নেই। বাংলাদেশের অনেক কিছু যেমন বদলেছে, তেমনি ঐ পুরনো ইতিহাসমণ্ডিত বাড়িটার জায়গায় উঠেছে নতুন, আধুনিক এবং বড় ইমারত। কিছুদিন পর সেই ইমারতের পাশে উঠলো আরেক দালান। বিয়ে থেকে শুরু করে 'জনসভা' মানে বহু লোক নিয়ে বড় বৈঠক আর কি, সবই হয় ওখানে। অল-পারপাস ব্যাপার-স্যাপার। নতুন মূল ভবনে খোলা জায়গা ভরাট হয়ে ছোট ছোট কুঠুরিতে পরিণত হলো, ভালোই। ওগুলোতে অল্প খরচে আলোচনা সভা, প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি করা যায়। গ্রাহকও বাড়ে। এসবই করতে হচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাব চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে।

এখন আমাদের এই নতুন ভবনের অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়েছে। বেশ আধুনিক ব্যবস্থা। আমার মতো সেকেলেদের জন্যে এসব সাজ কখনও মনে হয় চোখ ধাঁধানো। নতুনরা বলবে, 'স্লিক অ্যাণ্ড সফিসটিকেটেড'। দিন কয়েক আগে গিয়েছিলাম ক্লাবে। সঙ্গে আমার ছোট মেয়ে। ওরা বাল্যকাল থেকে এই ক্লাব দেখে এসেছে। চুপচাপ সব দেখলো। এটা কি, ওটা কি এরকম প্রশ্নও করলো মাঝে কয়েকটা। বাড়িতে ফিরে এসে আমি বললাম 'বেশ মডার্ন হয়েছে'। আজকাল বিভিন্ন বাণিজ্যিক অফিসে গেলে ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশনের বাহার দেখি, তার সঙ্গে বেশ মিল আছে। তবে আমাদের পুরনো সেই ক্লাবের গন্ধটা হারিয়ে গেছে। আমার মেয়েটির একটি জন্মগত অভ্যাস হলো, সে নিজে থেকে কোনও কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করে না। খুব ইচ্ছে হলে সুযোগ মতো এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি দু'টি বাক্যে মৃদু মন্তব্য করে। এবার সে একটা স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে বললো, 'আব্বা, আমিও ভাবছিলাম। বাড়ির ভেতরটা ক্লাবের মতো মনে হচ্ছিল না। হোটেলের লাউঞ্জ আর রেস্টুরেন্টের মতো লাগছিল।' তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করলো, 'তবে আরেকবার দেখলে তখন হয়তো অন্য রকম লাগবে।'

আসলেই তো। নবীন বরণের সময় কোনও কিছু একটু বিসদৃশ লাগলেও পরে তা সয়ে যায়।

এই কাহিনীটির অবতারণা এই জন্যে যে সময়ের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যম জগতের রূপও যে বদলাচ্ছে, সেই কথাটি প্রতীকীভাবে বর্ণনা করা। নাহলে ওটা নিছকই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। রূপের সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে চরিত্রের। বর্তমান সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। বৃহত্তর শক্তির আচরণে বিশ্ব-পরিবেশে যে পরিবর্তন আসে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতো নমনীয়তা থাকলে তবেই নাকি তুলনামূলকভাবে দুর্বলরা অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। এটাই নাকি বিবর্তনের বিধান। আমাদের বেলায়ও তাই হচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কি, সাংবাদিক হিসেবে আমি নিজেকে নানান দিক থেকে আক্রান্ত মনে করি। সম্ভবত আমার পেশার ভাই-বোনেরা অনেকেও সেরকমই অনুভব করেন। এখন বিপদ আমাদের নানান দিক থেকে– দেশে ও বিদেশে। মার্কিনীরা জর্জ ডব্লিউ বুশ নামে প্রায় উন্মাদ, এবং অবশ্যই হিংস্র ও উন্মত্ত একটি লোককে তাদের রাষ্ট্রপতি হবার সুযোগ করে দেবার ফলে সমগ্র বিশ্ব এখন সামরিক শক্তির বর্বর আক্রমণে আক্রান্ত হবার আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। আমাদের চোখের সামনে মিথ্যা অজুহাতে ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় স্বাধীন ইরাক পরাধীন হয়ে গেল। প্যালেস্টিনিয়ানরা রোজ নিহত হচ্ছে। ইয়াসির আরাফাত ইসলামী সম্মেলনে যেতে পারলেন না। অং সান সুচী সামরিক জান্তার হাতে আবার গৃহবন্দী। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের যে কোনও স্থানে সাংবাদিকরা যে কোনও অপশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন। ইরাকে আল-জাজিরার দফতরে মার্কিনী সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় গোলা বর্ষণ করেছে। সেখানে একজন আরব সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম তারেক আইয়ুব। আরেকজন আরব সাংবাদিককে স্পেনে গ্রেফতার করা হয়েছে, তিনি আল-কায়েদার সহযোগী, এই অভিযোগে।

আমরা এখন বিদেশ ভ্রমণেও নিরাপদ নই। শ্বেতকায়রাও যে খুব খুশিতে আছেন, তা নয়। বিবিসি রেডিও ব্রিটিশ সরকারের মিথ্যাচার ফাঁস করে দেয়। জানিয়ে দেয় জনগণকে যে, ইরাক আক্রমণ করার অজুহাত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সেই দেশে পরমাণু ও রাসায়নিক অবৈধ অস্ত্র আছে একথা বলার জন্যে টনি ব্লেয়ারের সরকার গোয়েন্দা ও বিজ্ঞানীদের ওপর চাপ দিচ্ছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকার এমন প্রত্যাঘাত করেছে যে, একজন বৈজ্ঞানিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং বিবিসি তার সংবাদ পরিবেশনার স্বাধীনতা হারাতে বসেছে। আমেরিকাতে অতীব শ্রদ্ধাভাজন নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রধান অর্থনৈতিক সংবাদদাতা রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের মিথ্যাচার ও ইরাকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধকে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন নেটওয়ার্কগুলোর তো কথাই নাই। এই অবস্থায় আমরা বিদেশে কোথাও গিয়ে যদি মনে করি যে, এখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে এবং আমরা যা দেখছি তাই লিখতে পারি সেখান থেকে, সেটা একটা মারাত্মক ভ্রান্তিও হতে পারে।

দেশের ভেতরে তো আমাদের বিপদের শেষ নাই। কে যে কখন মার খাই, কে যে কার হাতে মরি, তার নিশ্চয়তা নেই। এই তো সেদিন দেখলাম এক ভদ্রবেশী ব্যবসায়ী কর্মকর্তা, যিনি এখন 'প্রেষণে' বা 'অনুরোধে' সরকারী কর্মকর্তাও বটে, তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করতে এলেন গুণ্ডা-পাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে। সেইসব পাণ্ডারা আবার বলে গেল, 'ঠ্যাং ভেঙে দিলে সাংবাদিকতা বেরিয়ে যাবে।' আমরা দেখতে পাই, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বক্তৃতার মঞ্চে ওঠে পুলিশ কর্তৃক চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। হাসপাতালে খবর যোগাড় করতে গেলে সাংবাদিকদের মারধোর করে, ক্যামেরা কেড়ে রেখে দেয় ডাক্তার-নার্স ওয়ার্ডবয় ও তাদের বহিরাগত বন্ধুরা। উকিলরাও সাংবাদিকদের মারতে আসেন। ব্যর্থ পুলিশ কর্মকর্তারা দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে ইসলামী জঙ্গীদের খবর ছাপতে মানা করেন। সরকার যখন তখন যাকে ইচ্ছা তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে জেলে পাঠায়। অন্যদিকে বিরোধী

দলীয়রা তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান না গাইলেও গালমন্দ করেন। দেশ-বিখ্যাত দলীয় 'বিভাজন' সাংবাদিকদের মধ্যে তো রয়েছেই। এখন তার জের ধরে মামলা-মোকদ্দমাও হচ্ছে। কোনও পত্রিকায় বা অন্য মাধ্যমে চাকরি দেবার বেলায়ও পিঠে কোন্ দলের ছাপ, তা দেখে নেয়া হয়। একুশে টেলিভিশন এক সময় বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অপছন্দের ছিল বলে মালিকানা বদলের পরও পুনরায় সম্প্রচারের লাইসেন্স সরল পথে দেওয়া হবে না।

একই সঙ্গে শুরু হয়েছে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকানার ব্যবসায়ীকরণ। সৎ পথে বা অসৎ পথে যেসব ব্যবসায়ী অঢেল টাকা হস্তগত করেছেন, তাঁরা এখন একাধিক ব্যবসায়ে 'বিনিয়োগ' করছেন। এঁদেরকে এখন আর অমুক কারখানার মালিক বা তমুক শিল্পোদ্যোক্তা বলা হয় না। ইনারা এখন 'হাউস' (Business House), এইসব ঢাউস ঢাউস হাউসরা এক সময় সরকারী আমলা আর ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের কিনতো। এইসব হাউস-মালিকানাধীন পত্রিকা নিয়ে দুই বিপদ। এক হচ্ছে, কোনও এক ব্যবসায়ী হাউসের সঙ্গে অন্য হাউসের দ্বন্দ্ব লেগে গেলে তখন একজন সাংবাদিককে তিনি যে পত্রিকায় চাকরি করছেন সেই পত্রিকার মালিকের পক্ষ নিয়ে প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করার জন্যে কলমযুদ্ধে নামতে হয়। এ কাজটিতে যথেষ্ট নোংরামো থাকে। একই সঙ্গে এইসব ঢাউস 'হাউসরা' সব সময়ই কোনও না কোনও রাজনৈতিক নেতাকে খুশি রাখার চেষ্টা করেন এবং তাঁর দলকে অর্থ সাহায্য দেন। তাঁর মালিকানাধীন পত্রিকাটিকেও তদ্রূপ আচরণ করতে হয়। সেখানে চাকরিরত সাংবাদিককে শুধু সে অনুযায়ী কলম চালাতেই হয় তা না, সঙ্গে মগজ ধোলাই হতেও রাজী হতে হয়।

এখন হয়েছে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। প্রথমতঃ এসব হাউস তো সব বলশালী রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেয়ই, তদুপরি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে একেক সময় একেক দলের সঙ্গে যায়। দ্বিতীয়তঃ এখন একই দলের সদস্যদের মধ্য থেকে একাধিক ব্যক্তি আলাদা আলাদা পত্রিকা প্রকাশ করতে নেমেছেন। আমার সন্দেহ, তারা চাঁদাবাজি করে বা ঋণের গুণে ব্যাংক লুট করে যে পয়সা কামিয়েছেন, সেটা সামলে রাখতে পত্রিকা বা টেলিভিশনের মালিক হতে চান। এইসব পত্রিকায় কাজ করা খুব কঠিন, কারণ সব সময়ই লক্ষ্য রাখতে হয় এর আসল মালিকটি কে। তাকে এবং তিনি এই মুহূর্তে যাকে বন্দনা করছেন তাকে খুশি রাখা যাবে কিভাবে? অন্ততঃ তাঁরা যাতে নাখোশ না হন, সেটা নিশ্চিত করা যাবে কিভাবে।

যেসব দেশে নষ্ট রাজনীতিবিদ এবং দুশ্চরিত্র ব্যবসায়ীরা সমাজপতি হন, সেসব দেশে সাংবাদিকতা করা খুবই কঠিন কাজ।

লেখক দৈনিক আমার দেশ -এর উপদেষ্টা সম্পাদক